বি শে ষ
প্র তি বে দ ন

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস

নির্বাচন মানেই উৎসব। আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঢাকা, রাজশাহী, খুলনার জনগণের কাছে উৎসব নয়, আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। ভয়াবহ সব সন্ত্রাসীরা কমিশনার প্রার্থী হয়েছে। সন্ত্রাসীরা জনপ্রতিনিনিধি হতে চাচ্ছে এর মধ্য দিয়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস করতে পারবে...

লেখেছেন **জাকির হোসেন ও সাইফুল হাসান,** ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

সেন্টু ও জাকির হোসেন চিহ্নিত সন্ত্রাসী , এরা কমিশনার(!) প্রার্থী হয়েছে

সরকারি চাকরিতে আবেদনের জন্য চারিত্রিক সনদপত্র প্রয়োজন। বন্ধুর চারিত্রিক সনদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম ২৭ নং ওয়ার্ড কমিশনার রহমত আলীর কাছে। কমিশনার চেয়ারে বসা। চারপাশ ঘিরে আছে সাঙ্গপাঙ্গ। কমিশনারের কক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিরা কমিশনারের খুব কাছের লোক। কিছু উঠতি বয়সের যুবকও আছে। তাকে দেখে সুদ ব্যবস্থার কারবারি মহাজন বলে মনে হয়। আমার বন্ধুটি চারিত্রিক সনদপত্র চাইতেই কমিশনার তার পিএকে বলে দিলেন একটি সনদ দিতে। সনদ নিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু যে বিষয়টি মনে প্রশ্ন তুলেছে তা হলো এই ব্যক্তি কমিশনার হয় কি করে? কমিশনার সম্পর্কে জানতে চাইলাম বন্ধুটির কাছে। বন্ধু জানায়, মাদারটেক এলাকার প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে রহমত আলী একজন। রাতভর মদ আর ঠিকাদারি ব্যবসায়ী হিসেবে রহমত আলীর পরিচয়। সামাজিক কর্মকান্ডে তাকে কখনো পাওয়া যায়না। শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে তার সামাজিক ওঠাবাসাও হয় না। কারণ কমিশনার হবার আগেও তাকে মাতাল অবস্থায় পাওয়া যেত মাদারটেক বাজারে। শিক্ষিত ও ভদ্রলোকেরা তাকে এড়িয়ে চলতো। বন্ধু জানায়, তার পাশে যুবক ছেলেগুলো এলাকার মাস্তান। তারাও নেশাগ্রস্ত। নেশার যোগান দেন কমিশনার নিজেই। আর মুরুব্বি গোছের লোকগুলো রহমত আলীর মদ পার্টনার। গত নির্বাচনে প্রভাব খাটিয়েই সে কমিশনার হয়েছিল।

এ অবস্থায় প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, যে কমিশনার আমার আপনার চারিত্রিক সনদ দিচ্ছে তার নিজের চরিত্রের সনদটি কে দেবে? সিটি কর্পোরেশন, রাষ্ট্র, নাকি সরকার? দীর্ঘ আট বছর পর দেশে দ্বিতীয়বারের মতো কমিশনার নির্বাচন হতে যাচ্ছে। বিরোধীদলবিহীন এই নির্বাচন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের কাছে তাৎপর্য বহন করলেও জনগণকে খুব একটা নাড়া দিতে পারছে না। মেয়রকে বলা হয় নগরীর হর্তাকর্তা। আর কমিশনার এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধি। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে জনগণ মশার কামড় খেয়েছে ভাঙা রাস্তা আর ডাস্টবিনের আবর্জনার গন্ধে তিক্ত হয়ে মেয়রকে গালমন্দ করেছে। ওয়ার্ড কমিশনারকে খোঁজেনি। কারণ অনেকেই জানেই না একজন ওয়ার্ড কমিশনারের কাজ কি? সাপ্তাহিক ২০০০-এর ওয়ার্ডভিত্তিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কোনো কোনো এলাকার অধিবাসীরা জানেন না তিনি কতো

নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। অনেকে এমনও বলেছে আমি আমার ওয়ার্ড কমিশনারকে কখনও দেখিনি। তাকে দিয়ে এলাকার উন্নয়ন কি হয়েছে জানি না। আমরা সিটি কর্পোরেশন বলতে মেয়রকেই বুঝি। তাই নগরীর সমস্যা নিয়ে তাকেই দোষারোপ করবো।

কমিশনার নিয়ে এলাকাবাসীর যখন এ ধারণা তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটি এসে যায়, কমিশনার হওয়ার পেছনে স্বার্থ কি? রাজনৈতিক ক্ষমতা, নাকি এলাকাভিত্তিক আধিপত্য। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কমিশনার প্রার্থী বলেন, এক সময় কমিশনার হওয়া রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। রাজনৈতিকভাবে নিজের পরিচিতিকে তুলে ধরতে নেতারা কমিশনার হতে চাইতো। অবশ্য এর সঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টিও থাকতো। বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যানারের চাইতে আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে কারণে সমাজের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা কমিশনার হতে চাইছে। রাজনৈতিক নেতারাও তাদের সমর্থন দিচ্ছে নেতার নিজ স্বার্থে। ফলে একজন ওয়ার্ড কমিশনার যখন সন্ত্রাসী হয় তখন এলাকার উন্নয়ন তার মাথায় থাকে না। সে জনগণের স্বার্থে কাজ করে না। জনগণ নিয়ে ভাবেও না। মাথায় থাকে দখল, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি। স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজতে থাকা কমিশনাররা কতভাবে জনগণের টাকা আত্মসাৎ করা যায় সেই চিন্তায় বিভোর থাকে।

'৯৪ সালে নির্বাচনে যারা কমিশনার হয়েছিলেন তাদের অনেকেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, টেন্ডারবাজির সঙ্গে এই সব কমিশনারের নাম উচ্চারিত হয়।

কমিশনার কে সন্ত্রাসী না নেতা

শফিকুল ইসলাম সেন্টু। ১৫ মার্চ গভীর রাতে বিডিআর তাকে ৭টি আগ্নেয়াস্ত্র ও সহস্রাধিক গুলিসহ গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে সে জেলে রয়েছে। এই সেন্টু এবার ৪৪ নং ওয়ার্ড থেকে কমিশনার নির্বাচন করবে। এ লক্ষ্যে তার হয়ে নমিনেশন পেপারও জমা দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সেন্টু কে ? সমাজ তাকে চেনে সন্ত্রাসী হিসেবে। শুধু আজ নয়, ২০ বছর আগে থেকে মোহাম্মদপুর এলাকায় তথা ঢাকা শহরে সে শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। এই সেন্টু যদি নির্বাচিত হয় তার দ্বারা জনগণের কতটুকু কল্যাণ হবে?

মোহাম্মদপুরের স্থানীয় বাসিন্দা সেন্টু। ৮০-র দশকে শ্যামলী সিনেমা হলের টিকেট ব্ল্যাক করার মধ্য দিয়ে তার জীবন শুরু। এ সময়ই সে শ্যামলী ও আগারগাঁও এলাকার সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ভিড়ে যায়। তখন থেকে টিকেট ব্ল্যাক করার পাশাপাশি ছোটখাটো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে থাকে। '৮০ সালে সোনালী ব্যাংক তেজগাঁও শাখা থেকে ১৭ লাখ টাকা ডাকাতি করে সেন্টু ও তার দল। এই ঘটনায় সে গ্রেপ্তার হয়। পরে এ ঘটনা থেকে কৌশলে সেন্টু জেল থেকে বেরিয়ে এলেও তার সহযোগী কায়উম ও মতিন এখনও কারাগারেই আছে। এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর সুযোগ সন্ধানী সেন্টু জাতীয় পার্টিতে ভিড়ে যায়। গায়ে রাজনৈতিক নেতার সিল পড়ার পর সেন্টুকে আর পেছনে ফিরতে হয়নি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় সেন্টু হয়ে ওঠে মোহাম্মদপুর এলাকার মুকুটহীন সন্ত্রাসী। জাতীয় পার্টির সময় সে কমিশনারও নির্বাচিত হয়। জানা যায়, রাজনীতিতে নাম লেখানোর পর সেন্টু নিজেকে সরাসরি অপরাধ করা থেকে রিবত রাখে। তার বাহিনী দিয়ে কাজ চালাতে থাকে। মোহাম্মদপুর, টাউন হল, আগারগাঁও বস্তিসহ এ এলাকার সব অপরাধের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতো। শূন্য কপর্দকহীন সেন্টু রাজনীতির সিল গায়ে লাগিয়ে বলগাহীন সন্ত্রাসের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়। সেই সঙ্গে বদলে যেতে থাকে তার সামাজিক অবস্থান। টিকেট ব্ল্যাকার সেন্টু সন্ত্রাসী থেকে হয়ে ওঠে জননেতা এবং সন্ত্রাসীদের গডফাদার। '৯০ সালে এরশাদের পতন হলে সেন্টুও নিজেকে গুটিয়ে নেয়। খুব সাবধানে এগুতে থাকে সে। মোহাম্মদপুর ও তার আশপাশের এলাকায় অনুসন্ধানে জানা যায়, ইদানীং সেন্টু অস্ত্র ভাড়া দেয়া, সন্ত্রাসীর মধ্যে গোপন যোগাযোগ রক্ষা, নেটওয়ার্ক তৈরি করার কাজ করতো। সে আগারগাঁও বস্তির একাংশের মাদক ব্যবসাও নিয়ন্ত্রণ করতো। ৪ মার্চ সোনালী ব্যাংক পাট গবেষণা কেন্দ্র শাখায় ব্যাংক ডাকাতি হয়। ১৬ লাখ টাকা ডাকাতরা লুট করে নিয়ে যায়। এই ব্যাংক ডাকাতির পর সেন্টুর নাম আবার সামনে আসে। জানা যায় এই অভিযোগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সেন্টুর পক্ষে যারা নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছে তারা কি সমাজের সাধারণ মানুষ? না সন্ত্রাসী কিংবা সন্ত্রাসের সহযোগী।

পোস্তগোলা এলাকার কমিশনার শহীদ। কমিশনার হিসেবে যতটা তার পরিচিতি তারচেয়েও বেশি পরিচিতি সন্ত্রাসী হিসেবে। এক সময়ের কাঁচা তরকারি ব্যবসায়ী শহীদ আজ কমিশনার ও রাজনৈতিক নেতা। '৮০ সালের দিকে কাঁচামালের ব্যবসা শুরু করলেও ব্যবসায় তার মন বসেনি। গাড়ি-

অস্ত্রসহ গ্রেফতার হয়েছিল রাজু। আজ সে কমিশনার প্রার্থী। তাও আবার ক্ষমতাসীন দলের ব্যানারে

বাড়ি-অর্থের লোভ তাকে চাঁদাবাজির দিকে ঠেলে দেয়। শহীদ ব্যবসা বাদ দিয়ে পোস্তগোলা কাঁচাবাজার এলাকায় চাঁদাবাজি শুরু করে। এ সময় তার কিছু সহযোগীও জুটে যায়। চাঁদাবাজির এলাকা বাড়তে থাকে। পোস্তগোলা-গেন্ডারিয়ার লোহার মার্কেটে সে মূলত মূল চাঁদাবাজি চালাতে থাকে। সেই সঙ্গে সুযোগ খুঁজতে থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা। '৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। পরবর্তীতে এরশাদ যখন জাতীয় পার্টি গঠন করে তখন শহীদ জাতীয় পার্টিতে ঢুকে যায়। জাতীয় পার্টির নেতা সেজে যাওয়ায় শহীদের দুটো লাভ হয়। এক. সে এলাকায় নেতার স্বীকৃতি পায়। দুই.চাঁদাবাজি বা অন্যান্য অপকর্মের জন্য তখন আর শহীদকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হতো না। তার হয়ে বাহিনীর ছেলেরাই সব করতো। শহীদ ও তার বাহিনীর অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কোনো কথাই বলতে পারতো না এলাকার জনগণ। এরশাদের সময় কমিশনার নির্বাচিত হতো সিলেকশনে। যেহেতু জাতীয় পার্টি ক্ষমতায়, অতএব শহীদের কমিশনার হতে কোনো কষ্ট হয়নি। এলাকাবাসীর মতে, কমিশনার হওয়ার পর শহীদের চাঁদাবাজি বৈধতা পায়। রাষ্ট্র, সরকার, পুলিশ সব তার সঙ্গে অতএব শহীদ যা বলে গেন্ডারিয়ায় সেটা পালন করা এলাকাবাসীর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এরশাদ সরকারের পতনের পর শহীদ কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করে। বিএনপি ক্ষমতায় এলেও তার সমস্যা হয় না।

বার বার কারাগারে যায় কে? সন্ত্রাসী না সাধারণ মানুষ

জানা যায়, সে সময় শহীদের সহযোগী বাবু, আবুল, লম্বা বুলু, জাকির, আবেদরাই শহীদের হয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতো। আর এদের নিয়ন্ত্রণ করতো শহীদের ভাগিনা কামাল। তাকে সেল্টার দিত ঐ এলাকার একজন শীর্ষ বিএনপি নেতা বলে জানা যায়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শহীদ আবার পুরনো রূপে ফিরে যায়। ১৯৯৯ সালে পোস্তগোলার চাঞ্চল্যকর সুমন হত্যা মামলার প্রধান আসামি সে। ডিবি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতে বাসায় গিয়ে সুমনকে গুলি করে হত্যা করে। সুমনের সঙ্গে এলাকায় আধিপত্য নিয়ে শহীদ কমিশনারের আগে থেকেই সমস্যা ছিল। ঘটনার দিন শহীদ কমিশনার আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। উল্লেখ্য, সুমনও আওয়ামী লীগের কর্মী ছিলো। এরকম একজন খুনি, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ যদি কোনো এলাকার কমিশনার হয় তবে সেই এলাকার জনগণের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

রাজু মোহাম্মদপুর এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী। খুন, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা এমন কোনো কাজ নেই যা কেএম আহমেদ রাজু করে না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুরো মোহাম্মদপুর এলাকার সন্ত্রাসের অভিভাবক হচ্ছে রাজু। এ অভিযোগ এলাকাবাসীর । কিছুদিন আগে রাতে বিডিআর তার বাসায় হানা দিলেও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। জানা যায় বিএনপির একজন নেতা ও পুলিশ তাকে আগেই এই অভিযোগের কথা জানিয়ে দেয়। রাজু আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে। মোহাম্মদপুর এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজু স্থানীয় বিএনপি নেতা। তবে তার বড় পরিচয় সে হলো পেশাদার খুনি ও সন্ত্রাসী। আগাগোড়াই বিএনপি'র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ৪৪ নং ওয়ার্ডের বিএনপি'র যুগ্ম সম্পাদক ফারুক হোসেন বাবুল, বাবুল হত্যা, বিএনপি নেতা কামালসহ অন্তত ১৫ মামলার আসামি হচ্ছে রাজু। রাজনৈতিক কারণেই গত ৫ বছর রাজু কিছুটা চুপচাপ ছিল। বিএনপি যেদিন ক্ষমতায় আরোহণ করে সেদিন থেকেই মোহাম্মদপুরের সব ব্যবসায়ীর জন্য নতুন করে চাঁদা নির্ধারণ করে দেয় সে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এলাকায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী এহসানুল হক সেতুকে মাস দেড়েক আগে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করায়। যাতে নির্বাচনে তার কেনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। যদিও মোহাম্মদপুর থানার ওসি নূর আহমেদ রাজু সম্পর্কে বলেন, গত ৪-৫ মাসে তার সম্পর্কে থানায় কোনো অভিযোগ নেই। আগের পুরনো কিছু মামলা আছে। যেটা আওয়ামী লীগ সরকারের সময় দায়ের করা। সেই সঙ্গে ওসি এটাও বলেন, তারা রাজুকে গ্রেপ্তারের কোনো চেষ্টা করছেন না। কারণ তাদের কাছে রাজুর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। একটি থানার ওসি যখন রাজনৈতিক নেতার মতো করে সন্ত্রাসীদের পক্ষে কথা বলেন তখন বুঝতেই হয় ঐ নেতার ক্ষমতা অনেক। চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী রাজুর ভোটে দাঁড়ানোর কথা শুনে আতঙ্কিত, দিশেহারা। প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজু যদি কমিশনার হয় তবে কি উন্নয়ন হবে? না, তার চাঁদাবাজি বৈধতা পাবে কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

৩৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার মির্জা খোকন নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি ৮১টি মামলার আসামি। তবে পুলিশ তাকে এতোদিনেও গ্রেপ্তার করেনি। কারণ এলাকায় তার সুনাম রয়েছে।

এমন অসংখ্য উদাহরণের কথা বলা যাবে। মহাখালীর ইমাম। শীর্ষ ২৩ সন্ত্রাসীর একজন। তালিকায় তার নাম ৭ নম্বরে। মহাখালী এলাকার গার্মেন্টস ব্যবসায়ীসহ সবাই ইমাম বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ। হত্যা, অপহরণের মতো কাজ ইমামের কাছে ডাল-ভাত। সে আবার বিএনপি নেতা। ইমাম কমিশনার হতে চায়। কমিশনার হলে জনপ্রতিনিধির সিল গায়ে পড়ে যায়। তার সুবিধা অনেক। এটা বুঝেই সে ২০ নং ওয়ার্ড থেকে কমিশনার পদে দাঁড়িয়েছে।

নুরুল ইসলাম রতন, লালমাটিয়ার পাগলা মিজান, মির্জা খোকন, আব্দুল গাফফার, সাজ্জাদ জহির এরা প্রত্যেকেই কমিশনার ছিল। এদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয়নি। এদের নির্বাচিত করে জনগণ যেন অকল্যাণই ডেকে এনেছিল। রতন

কমিশনার, পাগলা মিজানরা বর্তমানে পলাতক। আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে এর মধ্যে ২৭৮জন রয়েছে যারা যার যার এলাকায় বড় মাপের সন্ত্রাসী। ২৭৮ জনের মধ্যে রয়েছে পাঁচজনই শীর্ষ সন্ত্রাসী। যাদের পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ তারা ঢাকা শহরে জনসম্মুখেই তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। পুরান ঢাকার আগা শামীম ২১ নং তালিকাভুক্ত। ইমনের শ্যালক টিটন ২, কিলার আব্বাস ১০ এবং আলাউদ্দিন আছে ১৭ নম্বরে। সুতরাং পুলিশ যে তাদের খুঁজছে না এটাই সত্যি এবং চরম সত্যি। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে দেশে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস করে দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপির দলীয় ব্যানারে সন্ত্রাসীরা কমিশনার পদে নমিনেশন চাইছে বিএনপি নেতারা এটা জানেনও। প্রধানমন্ত্রী এ ক্ষেত্রে আপনি কি জবাব দেবেন?

থানার ওসি যখন রাজনৈতিক নেতার মতো করে সন্ত্রাসীদের পক্ষে কথা বলেন তখন বুঝতেই হয় ঐ নেতার ক্ষমতা অনেক।

কালা খোকন

ইমাম

শহীদ কমিশনার

বদরুল

আলাউদ্দিন

আগে গ্রেপ্তার, তারপর নির্বাচন

কমিশনার পদে ২৭৮ জন সন্ত্রাসী প্রার্থীর কথা শুনে মানুষ খুবই আতঙ্কে আছে। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগগুলোও নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে বলে রিপোর্ট দিয়েছে।

৩৯ নং ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী হয়েছে জাকির হোসেন। পোস্টারে পাঞ্জাবি-টুপি পরা জাকিরকে আপাতত নিরীহ মনে হলেও সে নিরীহ প্রাণী নয়। সে কুখ্যাত সন্ত্রাসী সুইডেন আসলামের ছোট ভাই। সুইডেন আসলাম গ্রেপ্তার হবার পর তার বাহিনীর দায়িত্ব নেয় জাকির। রাজাবাজার, পূর্ব রাজা বাজার, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার এলাকা জুড়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে জাকির। মিরপুরের সন্ত্রাসী নিটলের ছোট ভাই ডিটেল প্রার্থী হয়েছে। আগে থেকেই এলাকায় তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। পুরনো ঢাকার আগা শামীম, কাফরুলের কিলার আব্বাস। ফুলবাড়িয়ার পিস্তল আহমেদ মিরপুরের নিউটন, ১০২ মামলার আসামি মোহাম্মদ মোহন, মহাখালীর ইমামের মতো সন্ত্রাসীরা এবার জনপ্রতিনিধি হওয়ার আশা ব্যক্ত করেছে। প্রত্যেকেই যার যার এলাকায় ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা প্রয়োজন তারা তা করবে। এসব সন্ত্রাসীর কাছে রয়েছে অর্থ ও অস্ত্র। যা তারা অতি সহজেই সাধারণ মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে পারছে। সাধারণ মানুষের কাছে অস্ত্র নেই, অর্থ নেই, রাজনৈতিক গডফাদার নেই এমনকি পুলিশও নেই। ফলে অস্ত্র আর অর্থের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে মানুষ। মোহাম্মদপুর থানার ওসি নূর মোহাম্মদ স্বীকার করলেন, নির্বাচনের সময় মোহাম্মদপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। মোহাম্মদপুর ৪৪ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী হচ্ছে কে এম আহমেদ রাজু, শফিকুল ইসলাম সেন্টু ও এহসানুল হক সেতু। সেতুর এলাকার জনগণের ঐ অর্থে কোনো অভিযোগ নেই। গত কয়েক বছর কমিশনারকে মানুষ প্রয়োজন মতো কাছে পায়নি এটাই তাদের অভিযোগ। এহসানুল হক সেতুও অভিযোগ স্বীকার করেছে। কিন্তু সেন্টু ও রাজুর অবস্থা ভিন্ন। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর পিচ্চি হেলালের সহযোগী কেএম আহমেদ রাজু অপ্রতিরোধ্য। তার হাতে দলের নেতৃবৃন্দই খুন হয়েছে। ৩৯ নং ওয়ার্ডের জাকির হোসেন এলাকায় সভা ডেকে স্পষ্ট বলেই দিয়েছে, নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করবে। আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আদৌ সুষ্ঠু ও অবাধ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করল ৪৪ নং ওয়ার্ডের কমিশনার এহসানুল হক সেতু।

পুরান ঢাকার আগা শামীম, কাফরুলের কিলার আব্বাস, মিরপুরের নিউটন মহাখালীর ইমামরা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় সে ক্ষেত্রে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া কি সম্ভব? ১০ নং ওয়ার্ডের আজহারুল হক। পেশায় ব্যবসায়ী। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন, ভোট দিতে না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেন অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাকে। একজন আজহারুল হকের অবস্থার মতো ঢাকা শহরের সব ওয়ার্ডের চিত্রই এক। একটি সূত্রে জানা যায়, মোহাম্মদপুর থানা বিএনপি'র আহ্বায়ক আফজালুল হক দলীয়ভাবে ৪৪ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচন করার জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন। কিন্তু আফজালুল হক মনোনয়নপত্র জমা দেননি সন্ত্রাসী রাজুর ভয়ে। এমন খবরও পাওয়া গেছে, মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে রাজুর বাহিনী আফজালুল হকের বাসায় কাফনের কাপড় পর্যন্ত পাঠায়। ফলে মান-সম্মান ও জীবনের ভয়ে আফজালুল হক নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না। ১৪ নং ওয়ার্ডের শাজাহান সাজু পোস্টারে লিখেছেন বার বার কারা নির্যাতিত নেতা তিনি। প্রশ্ন হচ্ছে সমাজের একজন সাধারণ মানুষ কি বারবার কারাগারে যায়? সাজু কি জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বার বার জেলে গেছে? ১৪ নং ওয়ার্ডের

অনেকেই বলেছেন তারা কিছু দিন আগে শুনেছে সে প্রার্থী হচ্ছে। এলাকায় তাকে সবাই সন্ত্রাসী হিসেবেই জানে। এতোগুলো হত্যা, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ীর নামে থানা যখন ঘোষণা করে তার নামে কোনো মামলা ঐভাবে নেই– এ থেকেই বোঝা যায় এই পুলিশ দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন কতখানি সম্ভব! শুধু ঢাকায় নয় সারা বাংলাদেশেই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কমিশনার পদে অনেক সন্ত্রাসী মনোনয়নপত্র কিনেছে। যেমন খুলনায় আসাদুজ্জামান লিটু ও এরশাদ শিকদার। লিটু বিখ্যাত সাংবাদিক শামসুর রহমান হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। এরশাদ শিকদার তো ফাঁসির আসামি। রাজশাহীতে প্রার্থী হয়েছে মাদক দ্রব্য ব্যবসায়ী আরমান, খুনি বিল্লালসহ অনেকে। এসব সন্ত্রাসীকে কারাগারের বাইরে রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন কি সম্ভব? উত্তর হচ্ছে 'না'। কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তার সঙ্গে সন্ত্রাসীদের সহযোগী/বন্ধু পুলিশ তো আছেই। পুলিশ বলছে, এসব সন্ত্রাসীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাস্তবতা হচ্ছে, এরা সবাই আছে এবং ভালোভাবেই আছে। একটি সূত্রে জানা গেছে, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, কারওয়ান বাজার এলাকার সন্ত্রাসীরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে তাদের প্রার্থীদের জিতিয়ে আনার জন্য। আগারগাঁও বস্তি, মোহাম্মদপুর বিহারিপট্টি কারওয়ান বাজারের বস্তিগুলোতে অস্ত্রের ভান্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় বর্তমান সরকারের দায় হলো সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন করা। বিএনপি'র জন্য এটা চ্যালেঞ্জও বলা যায়। অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্ব শর্তই হচ্ছে আগে গ্রেপ্তার করতে হবে এই সন্ত্রাসীদের। তারপর নির্বাচন। তা না হলে সাধারণ মানুষ সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিরাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। ফলে সরকারের একটি সুন্দর উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

দায় বিএনপির...

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার কাঠামোকে যত শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব হবে, গণতন্ত্রও তত সুদৃঢ় হবে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তাদের অধীনে প্রথম নির্বাচন। আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ না করায় নির্বাচনের আকর্ষণ অনেক কমে গেছে। এটা সত্য। কিন্তু যে বিষয়টি সামনে আসছে যেটি হলো, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শুধু বিএনপিই অংশগ্রহণ করছে। ৩টি সিটিতে মোট ২০৫৬ জন কমিশনার প্রার্থী। এদের সিংহভাগ প্রার্থীই বিএনপির। কমিশনার তালিকায় যে শত শত সন্ত্রাসী রয়েছে তারাও বিএনপির। জাকির হোসেন, নিউটন, ডিটেল, মোহাম্মদ মামুন, ১৪ নং ওয়ার্ডের শাজাহান সাজু, কেএম আহমেদ রাজু, প্রত্যেকের পোস্টার বা চিকায় খালেদা জিয়ার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক দিন থেকে এদের পোস্টার নগরীর বিভিন্ন দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। কখনো বিএনপি'র পক্ষ থেকে এই বিষয় নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করেনি।

পুরান ঢাকার আগা শামীম ২১ নং তালিকাভুক্ত। ইমনের শ্যালক টিটন ২, কিলার আব্বাস ১০ এবং আলাউদ্দিন আছে ১৭ নম্বরে। সুতরাং পুলিশ যে তাদের খুঁজছে না এটাই সত্যি এবং চরম সত্যি

অর্থাৎ যে সন্ত্রাসের কারণে মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট না দিয়ে বিএনপিকে ভোট দিয়েছিল সেই সন্ত্রাসীরাই আজ বিএনপিতে। এ প্রসঙ্গে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী এবং বর্তমানে মেয়র প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা তো গণতান্ত্রিক অধিকার। যে কেউ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবে আমাদের পার্টি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছে কে এলাকায় কাজ করেছে, কার এলাকায় ভালো পরিচিতি আছে তাকে। সন্ত্রাসীদের পোস্টারে দলীয় নেত্রীর ছবি ব্যবহারের প্রসঙ্গে বলেন, পোস্টারের জন্য হাসিনা, খালেদা সবার ছবিই ফরমেট আকারে প্রেসে থাকে। ফলে সন্ত্রাসীরা এটা ব্যবহার করতে পারছে। তবে নমিনেশন চূড়ান্ত করার পর আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন আমরা কেন সন্ত্রাসীদের নমিনেশন দিলাম। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ পত্রপত্রিকায় আসার পর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেসব সন্ত্রাসীর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার ছবি ব্যবহার করা প্রসঙ্গে বিএনপি ঢাকা মহানগরের এক নেতা বলেন, 'হ্যাঁ সন্ত্রাসীরা ম্যাডামের ছবি ব্যবহার করছে তাদের পোস্টারে, আমাদের দৃষ্টিতেও এসেছে বিষয়টি। কিন্তু ব্যাপার হলো, বিএনপি বিশাল দল, কে কখন কোথায় পোস্টার ছাপাচ্ছে এটা তো আমাদের পক্ষে দেখে রাখা সম্ভব নয়। কেউ তো আর অনুমতি নিয়ে পোস্টার ছাপায় না। তাছাড়া সন্ত্রাসীরা ম্যাডামের ছবি ব্যবহার করেছে বলে দল তো তাদের এখনও মনোনয়ন দেয়নি। কাকে মনোনয়ন দেয় দেখেন।' বিএনপি যাকেই মনোনয়ন দিক না কেন, এসব সন্ত্রাসীর সঙ্গে যে বিএনপির সম্পর্ক আছে এ কথা বিএনপি অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ এসব সন্ত্রাসী চিকায় বা পোস্টারে দলে তাদের অবস্থানও উল্লেখ করেছে। এতো সন্ত্রাসী যখন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় তখন বিএনপি'র সন্ত্রাস নির্মূলের ঘোষণা নিয়েও মানুষের মনে সন্দেহ জাগে। সুতরাং নিজের দলের সন্ত্রাসীদের লালন করে বিরোধী দলের সন্ত্রাস নির্মূল করতে গেলে লাভ হয় না। বরং সন্ত্রাসীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় আরও লাগামহীন হয়ে পড়ে। নিজের দলের এসব সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার দায় বিএনপির। গণতন্ত্র, সুস্থ সমাজ বা আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকেও যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে হয় তবে দলের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের কোনো বিকল্প নেই। মাঠে কোথাও আওয়ামী লীগ নেই। মাঠ পর্যায়ের অনেক বিএনপি নেতা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে অভিযোগ করেছেন, 'দলীয় সন্ত্রাসের কাছে তারা নিরাপদ নয়। সন্ত্রাসীদের হাতে বিএনপির অনেক নেতা-কর্মী খুন হতে পারে।' এ অবস্থায় কি করবে বিএনপি বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? দেশের জনগণ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। বর্তমান সরকার এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে ব্যর্থ হলে তার দায় বিএনপিকেই বহন করতে হবে।

কমিশনার প্রয়োজন আছে, নেই

ঢাকা শহরে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৯০। মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ২৬ জন। গড়ে ১০-এরও বেশি প্রার্থী প্রতি ওয়ার্ডে কেন? সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার কি এত গুরুত্বপূর্ণ পদ? '৯৪ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একজন কমিশনার প্রার্থীর ৫০/৬০ লাখ টাকা খরচ করার খবরও পত্রিকায় এসেছিল। এত টাকা খরচ করে কমিশনার হওয়া প্রয়োজন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা বহুলোকের সঙ্গে কথা বলেছি।

ধানমন্ডির রায়ের বাজার এলাকার রায়হান শেখ। অনেকদিন থেকে এলাকায় থাকেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করেন আমি আমার এলাকার কমিশনারকে আজ পর্যন্ত দেখিনি। তিনি কি কাজ করেন– সিটি কর্পোরেশনে আদৌ তার কাজ আছে কি-না আমি জানি না। তবে এলাকায় কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটলেই কমিশনারের নাম শোনা যায়'। রায়হান শেখ দুর্ঘটনা বলতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হত্যা বা অন্যান্য সব অঘটনকে ইঙ্গিত করছিলেন। রায়ের বাজার

এলাকায় দেখা গেছে গলির ভেতরের রাস্তা ভাঙ্গা, রাস্তার পাশে রাখা আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অনেক জায়গায় পানির সমস্যার কথাও শোনা গেল। এই চিত্র শুধু রায়ের বাজারের নয়, শহরের প্রায় ওয়ার্ডেরই।

রাস্তা ভাঙ্গা, আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে দোষ হয় মেয়রের। অথচ এটা দেখার কাজ কমিশনারের। কমিশনারের কাজ শুধু চারিত্রিক সনদ বিতরণ নয়। তার এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে কমিশনারের যুক্ত থাকার কথা। তারপরও মানুষ মেয়রকে দোষ দেয় কেন? এ বিষয়ে সাবেক এক কমিশনার বলেন, 'আসল ব্যাপার হলো ভাই কমিশনারকে কেউ চেনে না। কমিশনারও কাউকে চেনে না। যে জন্য মানুষ মেয়রকে দোষ দেয়। কমিশনার হলে সুবিধা এটাই– আপনাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। সব দায় মেয়রের।'

এই কমিশনারের কথা যে অনেকখানি সত্যি তা বোঝা গেল বর্তমানে কমিশনার প্রার্থী একজনের মুখে। তিনি বললেন, 'কেরিয়ার হিসেবে কমিশনারের কোন দাম নেই। টাকা বানাতে চাইলে এটা হল প্রথম ধাপ। ঢাকার প্রায় সব কমিশনারই প্রতিদিন শুধু ফুটপাতের ওপর বসা দোকান থেকে ১০ হাজার টাকার ওপর চাঁদা পায়। অন্যান্য সবকিছু বাদ। কমিশনার যে সনদ দেয়– সে কি চিনে দেয়? না ভাই কেউ কাউরে চেনে না। আমরাও চিনবো না। এটাই নিয়ম।' জানা গেছে এলাকায় যত ধরনের উন্নয়ন কাজ হয় তার ৫ শতাংশ কমিশন স্থানীয় কমিশনারের জন্য নির্ধারিত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যখন টেন্ডার হয় তখন এই কমিশনাররাই বিভিন্ন নামে টেন্ডার কিনে জমা দেয়। এবং যেভাবেই হোক তার এলাকার উন্নয়ন কাজের ঠিকাদারীটা সে বাগিয়ে নেয়। যেহেতু কাজ কেমন হচ্ছে তা তদারকির দায়িত্ব তার থাকে ফলে ঐ উন্নয়ন যে পকেটস্থ হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ প্রসঙ্গে ৩৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার মির্জা খোকন বলেন চাঁদাবাজি, মহল্লায় আধিপত্য বিস্তার করা যায়। এছাড়া রাজনৈতিক স্বার্থ খুব কম ক্ষেত্রেই আজকাল কাজ করে।

এলাকায় নিজের দাপট টিকিয়ে রাখতে এই কমিশনারের ভাড়াটে সন্ত্রাসী পুষতে হয়। কখনও নিজেকেই সন্ত্রাস করতে নামতে হয়। এছাড়া মাদক ব্যবসা চোরাচালানীসহ অনেক ধরনের পথ খুলে যায় কমিশনার নির্বাচিত হলে। তার মানে এই নয় যে সব কমিশনারই সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজদের মদতদাতা। অনেকের এলাকাই উন্নয়ন কাজ হয়েছে। অনেক কমিশনরাই জনগণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। তবে এই চিত্রটি কিছুটা ব্যতিক্রম। কমিশনার মানেই সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত, সন্ত্রাসী একটি চরিত্র। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন স্থানীয় সরকার কাঠামোকেও এমন অবিশ্বাসের জায়গায় ঠেলে দিয়েছে। ফলে প্রকৃত রাজনীতিদিরা পিছিয়ে পড়ছেন। সামনে চলে আসছে হিটম্যানরা। এই হিটম্যান প্রতিনিধিদের ঠেকাতে হলেও স্থানীয় সরকার কাঠামোর প্রয়োজন স্বচ্ছ নির্বাচন। সেই পরিবেশ বিএনপি নিশ্চিত করতে পারে কি-না এটাই দেখার বিষয়। আজকে কমিশনাররা চাঁদাবাজি বা সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে বলে কমিশনারের প্রয়োজন নেই তা নয়। বরং গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধিশালী করতে নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে কমিশনারের কোনো বিকল্প নেই। একটি দলের বা সরকারের কর্মসূচি প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কমিশনার বা গ্রামাঞ্চলের মেম্বাররাই সবচেয়ে ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন।

> বিগত বছরগুলোতে জনগণ মশার কামড় খেয়েছে ভাঙা রাস্তা আর ডাস্টবিনের আবর্জনার গন্ধে তিক্ত হয়ে মেয়রকে গালমন্দ করেছে। ওয়ার্ড কমিশনারকে খোঁজেনি। কারণ অনেকেই জানেই না একজন ওয়ার্ড কমিশনারের কাজ কি?

জনগণ নয়, অস্ত্র-অর্থ ক্ষমতার উৎস

ভোটের প্রসঙ্গ মানেই জনগণের সম্পৃক্ততা। জনগণ ভোট না দিলে জনপ্রতিনিধি তৈরি হবে কেমনে? জনগণ যদি ভোট না দেয় তবে সন্ত্রাসীরা কমিশনার নির্বাচিত হয় কিভাবে? ৪০ নং ওয়ার্ডের কমিশনার বলেন, 'আমি যদি সন্ত্রাসী হই তাহলে জনগণ ভোট দিল কিভাবে?' এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ৩৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার মির্জা খোকন নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি ৮১টি মামলার আসামি। তবে পুলিশ তাকে এতোদিনেও গ্রেপ্তার করেনি। কারণ এলাকায় তার সুনাম রয়েছে। তিনি জানান, আমি এলাকার জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। আওয়ামী লীগ আমলে রেলওয়ে কলোনি থেকে অনেক মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছি। '৯৪-এর নির্বাচনের পর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের এক ছাত্রকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা অপপ্রচার। আসলে ছেলের বাবা আমার শিক্ষক, তিনি আমার পোলিং এজেন্ট ছিলেন। তা ছাড়া ছেলেটি তো পিচ্চি, ওকে মারতে যাব কেন?

হ্যাঁ জনগণ ভোট দেয়। ভোট দেয়া জনগণের অধিকার। সে কারণে প্রশ্ন ওঠা উচিত জনগণ তার অধিকার কতটা প্রয়োগ করতে পারছে? সেটাও বিবেচ্য। জনগণ সবসময় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। '৯৪-এ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে লালবাগের ৭ হত্যার উদাহরণ দেয়া যায়। প্রধান দু'দল পরস্পরের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ আনে সব সময়। তাতে কি প্রমাণিত হয়?

সন্ত্রাসীদের হাতে রয়েছে অর্থ ও অস্ত্র। তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় দুর্নীতিবাজ পুলিশ, মন্ত্রী বা বড় কোনো রাজনৈতিক নেতা। জনগণের পাশে কেউ থাকে না। ফলে একজন সন্ত্রাসী যখন সাধারণ মানুষের কাছে যেয়ে ভোট চায় তখন সে অসহায় বোধ করে। হয় সে ভোট দিতে যায় অথবা যায় না। গেলেও হয়তো তার পছন্দের প্রার্থী থাকে না। কারণ সেন্টু বা রাজুকে ভোট দেয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর ওপর হুমকি– অর্থের প্রলোভন, অস্ত্রের শাসানি তো থাকেই। যে কোনো মূল্যে কমিশনার হওয়াটা মুখ্য, জনগণ নয়। এ কারণে হাত পা ধরে বা অস্ত্র দেখিয়ে যে ভাবেই হোক ভোট নিশ্চিত করবে সন্ত্রাসীরা। অসহায় জনগণ বাধ্য হয়েই এসব সন্ত্রাসীদের ভোট দেয়।

গণতন্ত্রে নির্বাচন গুরত্বপূর্ণ। উন্নত বিশ্বের গণতন্ত্র শক্তিশালী কারণ সেখানকার নির্বাচনী কাঠামো শক্তিশালী। বাংলাদেশের মতো ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক দেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচন যথাসময়ে করতে পারাটা খুবই মঙ্গলজনক। যদিও তা অধিকাংশ সময়েই সঠিক সময়ে হয় না। আগামী ২৫ এপ্রিল নির্বাচনে জনগণ যাতে অনেক বেশি সম্পৃক্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা করতে হবে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার পুলিশ প্রশাসনকে। আওয়ামী লীগহীন নির্বাচন নিয়ে এমনিতেই অনেক প্রশ্ন উঠবে। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি যদি এই সব সন্ত্রাসীদের নির্বাচনে জেতার সুযোগ করে দেয় সেটা হবে জাতির জন্য কষ্টদায়ক । আবার এই নির্বাচনে বর্তমান সরকার যদি অধিক সংখ্যক ভোটারদের অংশগ্রহণ করাতে পারে তবেই নির্বাচন হবে অর্থবহ। তবেই গণতন্ত্রের সুশাসন সম্পর্কে জনগণ আশাবাদী হয়ে উঠবে।